চর্যাপদে মৃত্যুভাবনা - লোকায়ত বিস্তার

তন্বী মুখোপাধ্যায়, *সহযোগী অধ্যাপিকা, স্নাতকোত্তর বাংলা বিভাগ, বেথুন কলেজ, কোলকাতা-৬*

সারসংক্ষেপ ঃ-

চর্যাপদের সময় বাংলাদেশের আকাশে নিষ্কন্টক শান্তি ছিল না। তবে এই কালের বাংলাদেশ অরাজকও ছিল না। পালরাজাদের অনেকেই ছিলেন অত্যন্ত পরাক্রমশালী। এঁদের বৌদ্ধ মতাবলম্বীদের প্রতি শ্রদ্ধা ছিল। এজন্য এই রাজাদের কেউ কেউ শৈব হওয়া সত্বেও মহাযানপন্থীদের মন্ত্রযান শাখা এবং আরও শাখা এখানে বিস্তৃত হয়েছিল। চর্যাপদগুলি তাঁদের সাধনার গান। অথচ চর্যাগুলিতে প্রধানত শ্রমজীবী মানুষদের জীবনচিত্র সাজানো রয়েছে। সন্ধ্যাভাষায় সাধক যোগীরা এই সাধারণ মানুষের জীবনকথার অন্তরালে রেখেছেন গূঢ় তন্ত্রমতরূপ তত্ত্ব। এগুলির বিবিধ ব্যাখ্যা দেওয়া যায়। তথাপি প্রচলিত মান্য ব্যাখ্যাগুলিকে গ্রহণ করলে এখানে বৌদ্ধধর্মের মূল আধার নজরে পড়ে। চর্যাপদে মৃত্যু-সংহার বা নাশ নিয়ে অনেকবার অনেক ভাব ব্যক্ত হয়েছে। আবহমান বৌদ্ধ ও অন্যান্য দর্শনের মৃত্যুভাবনার ছাপও এই চর্যাগুলিতে পাওয়া যায়। প্রধানত বৌদ্ধ দর্শনের মায়াভাবনা ও লোকায়ত দেহাত্মবাদী জগৎ এই গানগুলিতে পাশাপাশি অবস্থিত। শ্রেণীবিভক্ত ও বর্ণ বৈষম্যপূর্ণ সমাজের জীবনযাত্রার পুঙ্খানুপুঙ্খ পরিচয় দিতে গিয়ে তাঁরা লোকায়ত দর্শনকে অনুভব করেছিলেন। তাঁদের ধ্যানধারণা দ্বারা লোকজীবনকে তাঁরা প্রভাবিত করেছেন এবং বিপরীতও ঘটেছে। মৃত্যুভাবনার পরিপ্রেক্ষিতে এই দ্বন্দ্ব সমন্বয় প্রকাশ পেয়েছে। প্রান্তিক অনার্যদের বেদবিরোধিতা পূর্বেই লোকায়ত ও বৌদ্ধদের খুব কাছাকাছি এনেছিল। ক্রমশ লোকায়তাচার কী ভাবে ব্যাপ্ত হয়েছে সেই ধর্মমিশ্রণ সংক্রান্ত বিষয়গুলিকেও তাঁরা লক্ষ্য করেছিলেন। সাধক যোগীরা লোকায়ত জীবনের আনুকূল্য করতেই তাঁদের জীবন সত্য প্রকাশে ব্রতী হয়েছিলেন।

মূল শব্দগুচ্ছ ঃ- মৃত্যু, সম্পদ, চর্যা, লোকায়ত, কর্ম, জ্ঞান, মন্ত্রযান, কৌম, দ্বন্দ্ব, সমন্বয়, আনন্দ।

Knowledge Encyclopedia-তে বলা হচ্ছে ঃ

"The human body is not made to last forever. In later life, many organs go into decline, and risk of diseases such as cancer rises. Thanks to advances in medicine, hygiene and diet, however avaerage life expectancy is higher today than it has ever been and is still rising ..... এবং

... "Average life expectancy varies greatly around the world and is correlated with weatlth...."

অধিক আয়ু ও সে জন্য কম মৃত্যু স্বাভাবিকভাবে সমাজের উন্নতির চিহ্ন। সমাজব্যবস্থার বিশদ পরিচয় নিলে সে কালের উদ্ভূত দর্শনকে কারণসহ বুঝতে পারা যায়। আমাদের আলোচ্য যে চর্যাপদ, সেখানেও সমাজের স্বাক্ষর মুদ্রিত আছে। প্রধানত চর্যাপদে ব্যক্ত মৃত্যু - হত্যা - নাশ প্রভৃতি বিষয় লোকায়তিকের সামাজিক করণ, বিশ্বাস, ধর্ম, জীবিকাকে অবলম্বন করে বিধৃত হয়েছে। চর্যাগানগুলিতে জীবনযাত্রা ও জীবনদর্শনকে সামঞ্জস্যহীন বলে ভাবা যায় না। এর অন্তর্নিহিত অর্থ ও রূপক লক্ষণার্থ উভয়কেই বিশ্লেষণ করে জানা যায় এঁরা জগৎকে মায়া মনে করেন বটে তথাপি চর্যাকারগণ প্রাকৃতজনের পুঙ্খানুপুঙ্খ আচরণকে অনুসরণও করেন। তখনও মানুষ নিশ্চয়ই এটা জানতেন যে বয়স হ'লে মৃত্যুর সম্ভাবনা বাড়ে। দেহ নিত্য নয়। অর্থ থাকলে জীবন দীর্ঘতর হ'তে পারে। জানতেন নিশ্চিতভাবে।

চর্যাপদে অনেক এমন শব্দ ও বিষয় আছে, যেগুলি বিচিত্র টানাপোড়েনের সঙ্গে মৃত্যুর নিশ্চয়তাজ্ঞাপক। এখানে ব্যবহৃত হচ্ছে ঃ 'কাল', 'অজরামর', 'ভবনদী', 'নির্বাণ, 'অনাবাটা' বা অনাবর্ত বা ফিরে না আসা, 'মার ভয়ঙ্কর', 'গর্ভমোচন', 'খন্তায় সংহার', 'জীবন্তে মৃত্যু হ'লে', 'সকল অনুত্তর', 'গলায় পাশ', 'পঞ্চপাটন দগ্ধ', 'শবরকে দাহ', 'কাঁদল শকুন-শেয়াল', 'দশদিকে শ্রাদ্ধ পিণ্ড দেওয়া' জাতীয় অনেকগুলি প্রসঙ্গ। বারবার ঘুরে ফিরে চর্যাকারের গানে এসব প্রসঙ্গ আসছে। সন্ধ্যা ভাষায় যেহেতু যোগী সাধকরা তাঁদের সাধনার বিষয়ে অবহিত করতে চেয়েছেন, সেহেতু এঁদের ধর্ম-উপধর্ম-তন্ত্র যে রূপে জগৎ, মানুষ ও জীবনকে অনুভব করে তাই আক্ষরিক শব্দের দ্বারা দ্যোতিত হয়েছে। তথাপি চর্যাগুলিতে বৌদ্ধধর্ম ছাড়িয়ে লোকায়ত দর্শনের প্রভাব অনুমান করা যায়। বিশেষ করে মৃত্যু, এমন একটি পরিণাম যা তাঁদেরও বিষন্ন করেছে। মৃত্যু সত্বেও আমরা শোক জয় করতে পারবো অথবা মৃত্যুর জন্য আমরা সামাজিক কারণ খুঁজবো এবং অকাল মৃত্যু সম্বন্ধে সচেতন হবো। ধনবন্টন ব্যবস্থা, নানা সংস্কার, আচরণীয় সাধ্যসাধন, অর্থকরী ব্যবস্থাকেও আমরা এই শোকের মুহূর্তে কোন প্রশ্ন করবো ? সান্ত্বনা মানেই অধ্যাত্মবিশ্বাস – এটাই কি শেষ কথা ? কারা মৃত্যু নিয়ে ভাবছেন – এই সমস্ত প্রসঙ্গে নানাভাবে চর্যাপদগুলি আলোকপাত করেছে। প্রান্তিক মানুষের সামাজিক নীতি কী ছিল যা দিয়ে তাঁরা মৃত্যু সম্পর্কে দর্শন সৃষ্টি করেছিলেন।

'চর্যাগীতি পদাবলী' গ্রন্থে সুকুমার সেন বলেছেন যে, "অর্থ অধ্যাত্মঘটিত, পদান্তে মিল, দুই চরণ। দ্বিতীয় অর্ধেও সেইরূপ, তাহাকে বলে চর্যা।" — আরও বলা হচ্ছে যে, "চর্যা শব্দটির মূল অর্থ ছিল (১) আচরণ, ব্যবহার, (২) ভ্রাম্যমানের গৃহীত বেশ, ভেক, নটবেশ। সজ্জিত নট অর্থে

'চর্যাধর', কথাটি টীকাকার মুনি দত্ত অনেকবার ব্যবহার করেছেন। নটের অভিনয়কেও যে চর্যা বলিত তাহা মাধব আচার্য্যের কৃষ্ণমঙ্গল হইতে জানিতে পারি ----। সন্ন্যাসীর বা ভিক্ষুর আচরণবিধি অর্থে চর্যা শব্দের ব্যবহার বৌদ্ধ সাহিত্যে প্রচুর আছে।"

বৌদ্ধধর্মকে অনেকেই হিন্দুধর্মের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট মত বলেই ভেবেছেন, যেমন রাধাকৃষ্ণাণ। বহু অন্য প্রমাণও আছে। উপনিষদের প্রভাবও এর উপর যথেষ্ট। এমনকি মায়াবাদের সঙ্গে সাদৃশ্য হেতু শংকরাচার্যকে 'প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধ' বলা হয়েছে। অথচ বেদ শ্রুতি শাসন যে কালে আস্তিক্যবাদ সেকালে বৌদ্ধ ও লোকায়তিকরা একই রকম নাস্তিক। বেদবিরোধী উপধর্ম হিসেবে একসময় প্রাকৃতজনোপযোগী বৌদ্ধমত ও দর্শন উদ্ভূত হয়েছিল। বেদবিরোধী হিসেবে বৌদ্ধ-জৈন-লোকায়ত-কাপালিককে একই শ্রেণীভুক্ত করেছে শাস্ত্রীয় ধর্ম। তথাপি সময়ের অন্তে বৌদ্ধ আচার-আচরণীয় শাস্ত্রে পরিণত হ'তে চলেছিল। সে সময় যে সকল বিষয়ে কাঠিন্য ও ঋজুতা এসেছে তাও পরবর্তীকালে লোকায়ত প্রান্তিক ও শ্রমজীবীর দর্শন দ্বারা সমন্বয়ে নমনীয় হয়েছে। বৌদ্ধ সহজিয়া মতের দ্বারাই চর্যা গীত হ'ত, আবার কখনও হয়তো ছদ্মবেশী কোনো নট বা অন্য পরিব্রাজক দ্বারাও এগুলি চর্চিত হ'য়ে থাকতে পারে। দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় তাঁর লোকায়ত দর্শন গ্রন্থে অতএব হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর সিদ্ধান্তের পর্যালোচনা করেছেন ঃ- "তিনি সিদ্ধান্ত করছেন সহজিয়া বৈষ্ণব ইত্যাদি নামান্তরের আড়ালে লোকায়ত সম্প্রদায় আজও আমাদের দেশে টিকে রয়েছে। সেই সঙ্গেই কিন্তু তিনি বলছেন, সহজিয়া প্রভৃতি সম্প্রদায়গুলি অধঃপতিত মহাযান-বৌদ্ধধর্মেরই স্মারকমাত্র। এবং বৌদ্ধ ধর্মের অধঃপতনের কারণটা হ'ল প্রাকৃতজনের মধ্যে পরিব্যাপ্ত – 'লোকেষু আয়ত' হ'য়ে পড়া। এইভাবে স্থূল লোকের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ায় বৌদ্ধ ধর্মের মহান আদর্শগুলি নষ্ট হ'ল এবং ক্রমশই তা বীভৎস কামবিকারে পরিণত হ'য়ে পড়লো।"

দ্বিতীয় গুরুত্বপূর্ণ বিষয় সম্পদ বা অর্থ। প্রতি গোষ্ঠীই প্রাচীনকাল থেকে সম্পদ চেয়েছে। প্রকৃত সম্পদ লাভে মৃত্যুর বিষন্নতা, খেদ, ভয়, শোককে মানুষ দমন করতে পারে বলে সর্বজনের বিশ্বাস। খেটে খাওয়া মানুষই বা এক্ষেত্রে ব্যতিক্রমী হ'বেন কেন? সুখভোগেই অনিত্যতার সান্ত্বনা, চার্বাকমতে যার চিহ্ন বিদ্যমান। শ্রেণীবিভক্ত সমাজে যারা শ্রম দেবে তারাই শ্রমের সুখভোগ করবে এমন পরস্পর বিরোধী ঘটনা কীভাবে সম্ভব? তাই শ্রমিক ভোগ্য, বুদ্ধিজীবী ভোগী। শুধু তাই নয় যাঁরা সমাজের প্রধান শ্রেণী তাঁরাই মূল্য নির্ধারকও। সাধারণ মাঝি, বনিক, চাষী, ধুনুরি, ডোম এঁদের শ্রম ও ও উৎপাদন কৌশলের মূল্য হ'ল ক্রমহ্রাসমান। জাগতিক কৌশল-বিদ্যাকে জ্ঞানগর্ভ শাস্ত্রীয় ভাবনায় গৌণ ক'রে দেওয়া হ'ল। লোকসমাজে অধিকাংশ সাধারণ মানুষ নিজেদের পার্থিব অস্তিত্বকে পর্যন্ত মিথ্যা ভাবতে শুরু করলেন। লোকায়ত দর্শন কিন্তু এই শাসনের শাস্ত্রকে মানেনি, কেননা, প্রান্তিক মানুষের জীবন ধর্মের সঙ্গে এঁরা বরাবর যোগসাধন চেয়েছেন। অর্থাৎ 'লোকেষু আয়ত' - ----। দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়ের লোকায়ত দর্শন বলছে যে, "লোকায়ত অনুমান মানে না, ঈশ্বর ও আত্মা পরকাল পরলোক মানে না, ধর্ম ও মোক্ষ বলে পুরুষার্থ মানে না" কাম ও অর্থকে বলাই বাহুল্য যে তাঁরা মানেন। সমাজ কাঠামোর এই শ্রেণীগত দ্বন্দ্বই জনগণের দর্শনে পরিণত হয়েছে।

তবে দার্শনিক দ্বন্দ্ব- সমন্বয়ও নিরীক্ষাতে স্পষ্ট হবে। চর্যাগানগুলিতে দ্বন্দ্ব-সমন্বয়ের সন্ধিকাল অনুমিত হয়। দ্বন্দ্বের কারণ ব্যাখ্যায় লোকায়ত দর্শন গ্রন্থটির সাহায্য নেওয়া যায়। সেখানে বলা হয়েছে ঃ- "চেতনাই সর্বশক্তিমান - স্রষ্টার মতো। মানুষের ধ্যান- ধারণায় এ জাতীয় কথার আবির্ভাব হওয়ার বাস্তব শর্ত কী? জ্ঞান ও কর্মের মধ্যে সম্পর্ক বিচ্ছেদ; শুধু তাই নয় জ্ঞানের তুলনায় কর্মকে হেয় বা নিম্নবৃত্তি মনে করা।" আসলে ক্রমোন্নতির একটি পর্যায়ে শ্রমজীবীদের জ্ঞানের দৈন্য প্রকট, তাই তাঁরা উৎকট অভিচারাদি বা জাদুবিশ্বাস প্রমত্ত হ'য়ে পড়েন। একটি সভ্য সমাজ কিন্তু উপলব্ধি করে জ্ঞান ও কর্মের সহাবস্থানকে। চর্যাকারদের অন্বিষ্ট যে প্রজ্ঞা শুধু তাই নয় প্রজ্ঞার সঙ্গে তাঁরা উপায়ের মিলন চান। তাঁদের বিশিষ্ট প্রায়োগিক তন্ত্র ব্যতিরেকেও তত্ত্বকে সমন্বয়বাদী তত্ত্ব বলে বোঝা যায়। প্রতি মুহূর্তেই প্রতিটি চর্যাগানে তাঁরা রাগ নির্দেশ করছেন, পদকর্তার ভণিতা বা পরিচয় দিচ্ছেন এবং গুহ্য নির্দেশিকা তৎসঙ্গে তাঁরা প্রায় প্রতি চর্যায় শিকার, নৌকাবাহন, গাছ কাটা, পাটি তৈরি করা, এমনকি চুরি বা মদ তৈরি করার কাজেরও এক মূর্ত রূপ সৃষ্টি করেছেন। যাতে কর্মজীবনে কর্মসংসীত হিসেবে গৃহীত হ'বার উপযোগিতা চর্যায় অবোধ্য না থাকে।

ডঃ নির্মল দাশের 'চর্যাগীতি পরিক্রমা'নুযায়ী চর্যার সময় পালরাজাদের শাসনকাল। "চর্যাগানের রচনাকালের ঊর্দ্ধতমসীমা অষ্টম শতাব্দী। (প্রথম পালরাজা গোপালদেব আনুমানিক ৭৫০ খ্রীঃ) এবং নিম্নতম সীমা আনুমানিক দ্বাদশ শতাব্দী। (শেষ পাল নৃপতি মদন পাল আনুমানিক ১১৪০ খ্রীঃ।)" ঐতিহাসিকভাবে এই পটভূমির বৈশিষ্ট্য যদি বিচার করা যায় তাহ'লে

প্রথমে চর্যাপদের ভাষা হ'ল প্রাচীন বাংলা ভাষা, চর্যাচর্যবিনিশ্চয়ে অনুসারে (৪৬টি সম্পূর্ণ ও কয়েকটি খন্ডিত পদাংশ)।

দ্বিতীয়, "পাল রাজাদের বৌদ্ধ ধর্মানুরক্তির সুযোগেই বাংলাদেশে মহাযান বৌদ্ধধর্মের বিচিত্র শাখাবিস্তার ঘটেছিল, তারপর ব্রাহ্মণ্যধর্মাবলম্বী সেন-রাজাদের সময়ে রাজন্যবর্গের পরমত-অসহিষ্ণুতার জন্য এই ধর্মাচার ক্রমশ ক্ষীণ হয়ে তুর্কী আক্রমণের পর শেষ পর্যন্ত নাথ, শৈব, বৈষ্ণব, শাক্ত প্রভৃতি অন্য সম্প্রদায়ের সহজ সাধনার মধ্যে বিলীন হয়ে যায়।" (চর্যাগীতি পরিক্রমা, ড . নির্মল দাশ)

তৃতীয়, বিষয়টি হ'ল এ সময় বাংলাদেশ স্বশাসনের জন্য প্রতিদ্বন্দ্বিতা তথা যুদ্ধবিগ্রহ করেছে। মধ্যযুগে বাংলার সমাজ ও সংস্কৃতি বইটিতে (সম্পাদনা-অনিরুদ্ধ রায় ও রত্নাবলী চট্টোপাধ্যায়) 'বাঙালীর ধর্মীয় স্থাপত্য চর্চা নামক প্রবন্ধে হিতেশ রঞ্জন সান্যাল অবহিত করছেনঃ

"অষ্টম শতকের দ্বিতীয় ভাগে ধর্মপালের সময় হইতেই বাংলার শক্তিশালী নৃপতিগণ এ দেশের রাজনৈতিক অখন্ডতার জন্য চেষ্টা করিয়া আসিয়াছেন। তাঁহাদের প্রচেষ্টা যে সামগ্রিক জীবন ও সংস্কৃতি ধারা হইতে বিচ্ছিন্ন ব্যক্তিগত রাজনৈতিক উচ্চাকাঙ্ক্ষা মাত্র ছিল তাহা নহে।"

চতুর্থ, এই সময় সমস্ত প্রতিদ্বন্দ্বিতায় যে বাংলা জয়লাভ করেছে তা নয়; দীর্ঘদিন যুদ্ধ-দ্বন্দ্ব-টক্কর সমাজদ্বয়ের মধ্যেও আদানপ্রদান ঘটায়। এছাড়া যুদ্ধে ক্ষয়ক্ষতি দার্শনিক সত্যে উপনীত হবার ঘোরতর প্রয়াসকে দ্রুত প্রত্যয়ে পরিণত করতে পারে। ইতিহাসে জানা যাচ্ছে যে, ইন্দ্ররাজ বা ইন্দ্রায়ুধকে পরাস্ত করে ধর্মপাল কনৌজ বা কান্যকুব্জ অধিকার করেছিলেন, দেবপালকে বলা হয়েছে নেপালরাজ বিজয়ী। আবার অন্যদিকে প্রতিহাররাজ দ্বিতীয় নাগভট্টের প্রপৌত্র প্রথম মহেন্দ্রপাল বাংলা ও বিহারের বিস্তৃত অঞ্চল অধিকার করতে সমর্থ হয়েছিলেন।

পঞ্চম 'মধ্যযুগে বাংলার সমাজ ও সংস্কৃতি' গ্রন্থের 'বঙ্গীয় সমাজে জাতিবর্ণ প্রথা' নামক প্রবন্ধে লেখিকা স্বপ্না ভট্টাচার্য বলেছেন ঃ- 'পঞ্চম থেকে ত্রয়োদশ শতাব্দীর বাংলাদেশের ইতিহাসের দিকে দৃষ্টিপাত করলে দেখা যায় সর্বভারতীয় বর্ণব্যবস্থার ধারণা শাসকদের মধ্যে সুপ্রতিষ্ঠিত ছিল। চতুর্বর্ণ অর্থাৎ ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্রের মধ্যে উচ্চাবচ স্তরবিন্যাস তথা বর্ণের অপরিবর্তনীয়তা মধ্যযুগের বাংলা দেশের শাসকরা প্রচার করতেন। এই তথ্য জানা যায় শিলা ও তাম্রলিপিগুলি থেকে। বর্ণব্যবস্থার পাশাপাশি গড়ে উঠেছিল ভারতবর্ষের অন্যান্য অঞ্চলের মতো বাংলাদেশের জাতব্যবস্থা।' পাল-চন্দ্রবর্মন যুগ সম্বন্ধে লেখিকা জানাচ্ছেন যে কৌম কৈবর্ত সমাজ কিন্তু এই ব্রাহ্মণীকরণের যুগে বিরোধিতা করেছিল। এই সংঘর্ষের বর্ণনা দিতে গিয়ে রামচরিতকার কৈবর্তদের রাক্ষস, অনার্য ও মাংসভূক বলেছেন।

এছাড়া "পাল ও চন্দ্র রাজারা বৌদ্ধ (পরম সৌগত) হলেও ভূমিদানের গ্রহীতা হিসাবে প্রথম স্থান অধিকার করে আছেন ব্রাহ্মণরা এবং কোনো কোনো ক্ষেত্রে শৈব ও বৈষ্ণব দেরাধিষ্ঠান।" যদিও এই ব্রাহ্মণরা কেউ কেউ কৌম সমাজ থেকে উত্থিত হয়ে চাষবাসও করতেন।

সমাজের নানা শ্রেণীর ক্ষমতাবিন্যাসের তালিকাও স্বপ্না ভট্টাচার্য্য রেখেছেন। এখানে "সর্বশেষের স্তরে আছেন অন্ধ্র, চন্ডাল ও মেদ।"

ষষ্ঠ, বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত গ্রন্থের প্রথম খন্ডে অসিত কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছেন ঃ "বাংলাদেশে প্রধানত পালযুগেই মন্ত্রযান ধর্মশাখা প্রভূত প্রভাব বিস্তার করে এবং সংস্কৃত, প্রাকৃত, অপভ্রংশও আদিতম বাংলা ভাষায় এই মতের বিপুল ও বিচিত্র সাহিত্য রচিত হয়। বাংলায় বৌদ্ধধর্মের ইতিবৃত্তের প্রায় সমগ্র অংশটাই এই মন্ত্র-যান মতের অন্তর্ভুক্ত।" (মন্ত্র নয় থেকে সৃষ্টি হয়েছিল কালচক্রযান, বজ্রযান ও সহজযান। মন্ত্রনয়ই মন্ত্রযান।)

সপ্তম, চৌরাসি সিদ্ধাচার্যের মধ্যে ছিলেন লুইপা, ডোম্বী পা, শবর পা, সরহ পা, শান্তি পা, কাহ্ন পা, কুক্কুরি পা, ভুসুকু পা, জালন্ধর পা, দ্বারিক পা প্রমুখরা। বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত থেকে পাওয়া যায় যে, "এই সিদ্ধাচার্যগণ সমাজের নানা শ্রেণীর মধ্য হইতে আবির্ভূত হইয়াছিলেন। কেহ ব্রাহ্মণ, কেহ ক্ষত্রিয়, কেহ কায়স্থ, কেহ বণিক, কেহ বা শূদ্রবংশে জন্মলাভ করিয়াছিলেন।"

অষ্টম, তবে "চর্যাগীতির রচয়িতারা ডোম্বী, কামলি, শবর প্রমুখ অন্ত্যজ শ্রেণীর ব্যক্তি এবং চর্যাগীতির পাত্রপাত্রীগণও ডোমনী, চন্ডালী, শুণ্ডিনী, শবরী, শবর, ব্যাধ, জেলে প্রভৃতি অস্পৃশ্য শ্রেণীভুক্ত। সমাজের অভিজাত উচ্চবর্ণীয়েরা যে নিম্নবর্ণীয়দের সম্পর্কে এক ধরণের শুচিবায়ুগ্রস্ত জুগুপ্সা পোষণ করতেন তার ইঙ্গিত পাওয়া যায় কাহ্নপাদের একটি চর্যায় - "নগর বাহিরে ডোম্বি তোহোরি কুড়ি আ। ছোই ছোই জাহ সো বাহ্ম নাড়িয়া।।" (নগরের বাইরে ডোম্বী তোমার কুটির, তোমাকে ছুঁয়ে ছুঁয়ে যায় নেড়া ব্রাহ্মণ) ১০ নং চর্যা। (চর্যাগীতি পরিক্রমা)

চর্যার দুটি রূপে পরস্পরবিরোধী বক্তব্য। এর মূল অর্থ মোহমায়া আকাঙ্ক্ষা ত্যাগ করার কথায় পৌঁছয়। এর রূপকটি বড়োই জীবন-আলিঙ্গিত, মৃত্যু-সন্নিহিত। তাই চর্যা সাহিত্য হিসাবে এখনও সমাদৃত।

শব্দার্থ ধরে এগোলে মৃত্যু প্রসঙ্গে আনীত বিষয়গুলির দ্ব্যর্থব্যঞ্জক অবস্থান বিধৃত -

	শব্দ	**অভিপ্রেত বা মূল অর্থ**	**আপাত অর্থ বা আক্ষরিক**
(১)	মরণ বা মৃত্যুবোধক (মরিয়াই)	নিবৃত্তি	দেহের মৃত্যু, সাধারণ মরণ
(২)	কাল	প্রবৃত্তিদোষ	সংসার জ্ঞান বা ঐহিক
(৩)	দিবসরাত্রি	প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তি	দিনরাত
(৪)	মার	দুঃখের কারণ	হত্যা/হত্যাকারী
(৫)	ভবউল্লোল	বিষয়াসক্তির দুঃখ	বিপর্যয়

চর্যার 'মৃত্যু' নিয়ে আলোচনা করে সমন্বয়বাদী দর্শনকে পাওয়া গেল নিম্নলিখিত ব্যাখ্যায়ঃ-

(১) প্রথমত, উপজাতি-জীবনের জীবিকা ছিল শিকার, পশুপালন, পরে মানুষ কৃষিজীবী হয়েছে। উপজাতি জীবনের অনেক সংস্কার পরবর্তী কৃষিজীবী গ্রামজীবনে অভ্যস্ত মানবের আচারে লক্ষিত হয়েছে। কৌম সমাজের অনেক ট্যাবু মানা হয়েছে। সমবৃত্তির জ্ঞাতিত্ব মানা হচ্ছে। প্রকৃতপক্ষে

শ্রমিক সমাজের জন্ম অর্থ; সমষ্টির বৃদ্ধি, গণের প্রাচুর্য এবং শ্রমিকের নাশ অর্থ; সমষ্টির হানি, সম্পদের হ্রাস। দেহের মৃত্যু মানে ব্যাক্তির মৃত্যু তাঁরা মেনে নেবেন, কিন্তু গণ-কৌম-জ্ঞাতিত্ব বা বৃত্তি সমষ্টিগতভাবে আসলে তাঁদের অস্তিত্ব বলে তাঁরা মনে করেন। শ্রমিকের বৃত্তিগতভাবে সম্পদ সুপ্রচুরও কখনোই নেই। তাঁরা সৃষ্টিশীল কামেরই দ্বারস্থ। উর্বরতা চান তাঁরা। এতেই কৌম বৃদ্ধি।

চর্যাগানে একের পর এক মৃত্যু, নাশ, সংকট দেখা গেছে কর্মী মানুষের সংসার জীবনে। চর্যায় বলা হ'লঃ

"অপণে রচি রচি ভব নির্বাণা।
মিছে লো অ বন্ধাব এ অপনা।।
অন্তে ন জানহুঁ অচিন্ত জোই।
জাম মরণ ভব কইসন হোই।।
জইসো জাম মরণ বি তইসো।
জীবন্তে মঅলেঁ নাহি বিশেষো॥"

ভব-নির্বাণ নিজে নিজেই রচনা করে লোকে আপনাকে বন্ধন করে মিথ্যাই। অচিন্ত যোগী কিন্তু জানেন না জন্ম মরণ সংসার কেমন হয়। বোঝা যায় এঁরা সংসার করেন না। যেমন জন্ম তেমন মরণ, জীবিত ও মৃতে বিশেষ পার্থক্য নেই।

অনুমান করা যায় যোগীর জন্ম পরিচয় বর্তমানে তাঁর বৃত্তি বা গৃহ বা সংসার নেই বলে তাঁকে তাড়না করতে পারে না। কিন্তু সংসার তাড়িত জন্ম পরিচয় বহন করছে, ভব বা ঐহিকে বাঁচছে এবং তাঁর মৃত্যুও হচ্ছে। তাৎপর্যপূর্ণ একটি শ্লেষও অন্তরালে আছে যে তারা যে জীবনযাপণ করছে তাই কি মৃত্যুতুল্য নয় বা কিরূপ? বন্ধন প্রসঙ্গও আছে। জনসাধারণের দাসত্ব বন্ধনকে লোকায়ত দর্শন পুনঃ পুনঃ মনে করিয়ে দেয়। অর্থনৈতিকভাবেও একথা সত্য যে যার যে কুলে জন্ম, সে কুলে সেই অর্থনীতিতে তাঁর মৃত্যুও। তাই এই চর্যায় আছে ইতিহাস, আজও এগুলি প্রাসঙ্গিক।

(২) দ্বিতীয়ত, লুইপাদের গানে বলা হচ্ছেঃ

"কা আ তরুবর পঞ্চ বি ডাল।
চঞ্চল চী এ পইঠো কাল।।
দিঢ় করিঅ মহাসুহ পরিমান।
লুই ভণই গুরু পুচ্ছিঅ জান।
সঅল সমাহিঅ কাহি করিঅই।
সুখদুখেতেঁ নিচিত মরিআই।।"

[কায়রূপ একটি তরুর যেন পাঁচটি ডাল, নিত্য চঞ্চল তার চিত্তবিকারে তাতে কাল প্রবিষ্ট হয়। গুরুকে জিজ্ঞাসা করে মহাসুখজ্ঞান লাভ করো। সমাধি সকলে পরিত্রাণ নেই, সুখ দুঃখ নিয়ে নিশ্চিত মরতে হবে।]

এতেও যোগীর দৃষ্টি মহাসুখলাভের প্রতি, কিন্তু ভোগী যেন অবলীলায় বলছেন যে সুখ দুঃখ দুই ভোগ করে যে অবলীলায় মারা যাবেন এ বোধ তাঁর আছে। সমাধি ধ্যান এসব যোগীও অস্বীকার করছেন। যা ধ্রুব তা তো ঘটবেই। সুখ ও দুঃখ দুইকেই সমানভাবে কিন্তু বৌদ্ধ দর্শন স্বীকার করছে না।

(৩) তৃতীয়ত, "সহজে থির করি বারুণী বান্ধঅ ।
জে অজরামর হোই দিঢ় কান্ধ ।।"

[সহজাবস্থায় স্থির হ'লে মদ সাঁধায়, এতে অজর অমর দৃঢ় দেহ পাওয়া যায়।]

মদ্যপান প্রথা লোকমধ্যে প্রচলিত। এই পদের শেষে এমনকি দেখা যায় শুঁড়ি গৃহ থেকে নিষ্ক্রান্তও হচ্ছে না গ্রাহক। কোনোভাবে এদের মৃত্যু হচ্ছে হয়তো অত্যধিক মদ্যপানে। না হ'লে এতোটাই নেশাসক্ত মানুষ যে তার প্রমত্ততার শেষ নেই। চিত্রটাই জীবনাসক্তির।

'অজরামর', 'অনাবাটা', 'অনুত্তর' সাধকের কাছে নিবৃত্তি লাভ। লোকায়ত দার্শনিক একে মৃত্যু'ই বলবেন বলে বোধ হয়। লোকায়ত মত হ'ল অধ্যাত্মবাদ নয় দেহাত্মবাদই। পল্লব সেনগুপ্ত লোকসংস্কৃতির সীমানা ও স্বরূপ গ্রন্থে লিখেছেনঃ "লোকায়ত মতে বিশ্বচরাচর পাঁচটি ভূত বা উপাদানের মাধ্যমে গঠিত - ক্ষিতি (মৃত্তিকা), অপ (জল), তেজ (অগ্নি), মরুৎ (বাতাস) ও ব্যোম (শূন্যতা)। এই প্রতিটি উপাদানই অসংখ্য কণার সমাহারে সৃষ্টি, যে কণা নিচয় সৃষ্টির আদিকাল থেকে উদ্ভূত হয়েছে। এই কণার সমন্বয়েই চেতনা এবং ইন্দ্রিয় বোধের সৃষ্টি, জীবনেরও সৃষ্টি। মৃত্যুর পর এই কণা নিচয় আবার মৌলিক পঞ্চ উপাদানে মিশে যায়।" সুতরাং লৌকিক ভাষ্যই এটি যে, "জে জে উজুবাটে গেলা অনাবাটা ভইলা সোই"- [সে যে সোজা পথে গেল, সে আর ফিরল না।] একইভাবে শবরপাদের ২৮ নং পদে আছে -

"গুরুবাক পুঞ্চআ বিন্ধ নিঅ মনে বাণেঁ।
একে শরসন্ধানেঁ বিন্ধহ বিন্ধহ পরম নিবানেঁ॥
উমতো সবরো গরু আস রোষে।
গিরিবর -সিহর সন্ধি পইসন্তে সবরো লোড়িব কইসেঁ॥"

[গুরুবাক্য পুচ্ছবিশিষ্ট বাণ, তাতে মনকে বিঁধে, পরম নির্বাণকেও বিদ্ধ করো। উন্মত্ত শবর, গুরুতর রোষে উন্মত্ত । গিরির শিখর মধ্যে শবর অদৃশ্য হ'লে তাকে কিভাবে খুঁজবে?]
নিরুদ্দিষ্ট মানুষটি যদি ব্যক্তি হয় তার অর্থ একরূপ, আর 'শবর' অর্থ যদি গোষ্ঠী হয় তাহলে তাদের হারিয়ে যাবার অর্থ কিন্তু কৌমের বিনষ্টি।

(৪) চতুর্থত, লোকায়ত উর্বরতা মিথটি প্রসঙ্গত বলতে হয়। তাছাড়া চর্যাপদে নারী-পুরুষ মিলন বর্ণিত হয়েছে বারবার। কাপালিক প্রসঙ্গ নীত হয়েছে। কাম থেকেই কাপালিক, সেই উর্বরতা মিথের অংশ ছিল হত্যা বা বলি। কামকেন্দ্রিক সংস্কারকে যোগীগণ নানাভাবে প্রকাশ তথা প্রমাণ করেছেন। কাহ্নপাদের চর্যায় জানানো হয়েছে ঃ "মারি ও সাসু ননন্দ ঘরে সালী। / মা অ মারি আ কাহ্ন ভইঅ কবালী।।" এখানে কিন্তু সামাজিকভাবে কাপালিক ঘৃণ্য বলে বোধ হয়। [শাশুড়ি, ননদ এমন সব আত্মীয় বা আত্মীয়াকে হত্যা করে কিংবা মৃত্যুর দিকে ঠেলে দিয়ে নির্মম কাহ্ন কাপালিক হয়েছে।]
১০ নং চর্যায় মনে হয় খাদ্যের জন্য নিম্নশ্রেণীর মানুষ হত্যা করে থাকতে পারে। -

"সরবর ভাঙ্গিঅ ডোম্বী খা অ মোলান।
মারমি ডোম্বী লেমি পরাণ।।"

[সরোবর ভাঁজিয়া ডোমনী মৃণাল খায়। আমি ডোম্বীকে হত্যা করি।]

সন্দিগ্ধ মানুষকে দেখি যখন মানুষ কৌম ধর্ম ত্যাগ করে সম্পদ লাভের জন্য উদগ্র, লোভী। নিশ্চয় করে বোঝা যায় যে শাসক লোকায়ত ধর্মের অনুকূলে ছিলেন না; তাই এদের কাম, আকাঙ্ক্ষা, জীবন-জীবিকা সবই অবিদ্যাজাত। এরা নির্বুদ্ধি। এদের জীবনদর্শনকে ঘৃণাই করা হয়েছে উপর্যুপরি। অনার্য ভাবকে সমাজ ধারণ করে রেখেছে তলায় তলায় প্রায় নিশ্চুপে। তাই চর্যাকার এ কথাও বলেন যে,

"অমিয়া আচ্ছন্তে বিস গিলেসি রে চিঅ পরবস-অপা।
ঘরে পঁরে ক বুঝঝিলে মরে খাইব মই দুঠ-কুন্ডবাঁ।।
সরহ ভণই বর সুন গোহালী কিনো দুট্ঠ বলন্দে।।
একেঁলে জগ নাশি অরে বিহরহুঁ ঈইন্দ্রে।।

[অমিয় থাকতে কেন বিষ গিলিস। কে আপন কে পর বিচার করলে দুষ্ট কুটুম্ব বা মতান্তরে অসতী কন্যাকে খাব। সরহ ভণেন বরং শূণ্য গোয়ালই দুষ্ট বলদের চেয়ে ভালো, একলাই জগৎ নাশ করে আমি স্বচ্ছন্দে বিহার করি।]
কখনও দেখা যায় চর্যাকার এই নিম্নবর্গীয়দের জন্য সহানুভূতিশীল, আবার কখনও এঁরা তাঁদের ওপর খড়্গহস্ত। তবে লোকায়ত মত সমষ্টি মধ্যে অধিক ব্যাপ্ত, ফলত এর সবসময়ই অনুপেক্ষনীয় অস্তিত্ব আছে। প্রাসঙ্গিক উল্লেখযোগ্য একটি প্রবন্ধাংশ উদ্ধৃত হলো। বিনয় ঘোষের লেখা বাংলার ব্রত এবং অবনীন্দ্রনাথ থেকে উল্লেখ করা হলো ঃ
"..... হেমন্তের শস্য আশ্বিন-পূর্ণিমায় যখন ঘরে ওঠে তখন এই ব্রত অনুষ্ঠিত হয়। সকাল থেকে অনুষ্ঠানের প্রস্তুতি চলতে থাকে, সন্ধ্যায় লক্ষী পূজা। ---- উপাদানের মধ্যে শুয়োরের দাঁত, কড়ি, সিঁদুরের কৌটো, নারকেলের মালা, পিটুলির পুতুল, ডাব ও ফলমূল উল্লেখ্য। নারকেলের মালা হ'ল কুবেরের মাথা অর্থাৎ মাথার খুলি। শুয়োরের দাঁতটি কি? হয়তো দূর অতীতের কোনো আদিম কৌমের টোটেমের নিদর্শন। কড়িটা কি? ফলনশক্তির (fertility) প্রতীক। কড়ির ঝাঁপি ছাড়া লক্ষীপূজা হয় না। --- পিটুলি ও মাটির পুতুল অতীতের নরবলির প্রতীক। --- নরবলিও ফলনশক্তি বৃদ্ধির অনুষ্ঠান (fertility-cult)

এই সমস্তই হ'ল অনার্য অব্রাহ্মণ অনুষ্ঠানের উপকরণ।---আমাদেব দেশে যে 'অলক্ষ্মীবিদায়' নামে অলক্ষ্মীর পূজা হয়ে থাকে ঘরের বাইরে, তিনিই হলেন আসল অনার্য শস্যদেবী, যাকে 'অলক্ষ্মী' নাম দিয়ে ব্রাহ্মণ শাস্ত্রকাররা ঘরের বাইরে স্থান করে দিয়েছেন, কিন্তু পুজোটা ঘরের লক্ষ্মীর আগে বাইরের অলক্ষ্মীর প্রাপ্য। প্রাকৃতজনের দাবি এইভাবে শাস্ত্রকারেরা মেনে নিতে বাধ্য হয়েছেন এবং দুই পক্ষের মধ্যে একটা আপস

হয়েছে দেখা যায়। এটা একটা সাংস্কৃতিক সমন্বয় ও মিশ্রনের (যাকে সংস্কৃতিবিজ্ঞানীরা acculturation বলে) বিশেষ রীতি।

কার্যত চর্যাপদেও এই সাংস্কৃতিক মিশ্রণ দেখা গেল।

(৫) পঞ্চমত, "জে জে আইলা তে তে গেলো।
অবনাগবনে কাহ্নু বিমন ভইলা।।"

[যারা যারা এসেছে তারা তারা গেল। এই আসা যাওয়ায় কাহ্ন বিমনা হলেন।]
বর্ণভেদ সত্ত্বেও সামাজিক মিশ্রণ হয়েছে। যোগী সাধারণ মানুষের মৃত্যু নিয়ে ভাবিত। করুণা পারবশ্য যেমন আছে, তেমনই মানবিক দর্শনের জন্য আপনজনসুলভ বেদনাও দেখা যায়। নিছক নির্বেদ ছেড়ে কাহ্নকে বাইরে আসতে দেখা যায়। ২০ নং চর্যায় কুক্কুরীপার বর্ণনাও নিরাশাতুর। -

"হাউ নিবাসী খমন সাঈ।
মোহোর বিগোআ কহণ ন জাই।।
ফিটলেসু গো মা এ অন্তউড়ি চাহি।।
না এথুচাহসি সো এথু নাহি।।"

[আমি নিরাশ, শূন্য মনে কিছু বলা যায় না। গর্ভমোচন করলাম গো আমি মা, আমি আঁতুড়ের দিকে দেখি, যা আমি এখানে চাই তা এখানে নেই।]
একে বলা হয়েছে 'মৃতবৎসা চর্যা'। পতিহীনা নারীর গর্ভমোচনে নিরাশা বর্ণিত। ঠিক অন্য স্বরটিও শ্রুত হয় চর্যামধ্যেই। তা হলো

"চিঅ সহজে শূণ সংপুন্না।
কান্ধবিয়োএ মা হোহি বিসন্না।।
ভন কইসে কাহ্নু নাহি।
ফরই অনুদিনঁ তৈলো এ পমাই।।
মূঢ়া দিঠ নাঠ দেখি কাঅর।
ভাগতরঙ্গ কি সোসঈ সা অর।।"

[সহজাবস্থায় চিত্ত সম্পূর্ণ শূণ্য। স্কন্ধের বিনাশে কাতর হয়ো না। বলো, কিসে কাহ্ন নেই। সর্বদা যে রয়েছে ত্রিভুবন! দৃষ্ট বস্তুকে না দেখে যে কাতর হয় সে মূঢ়। তরঙ্গভঙ্গ কি সাগর শুষে নেয়?]

জয়নন্দীর চর্যাতেও তাই বলা হয়েছে তত্ত্ব কথা -
"ছাঅ মা আ কা অ সমানা।" (ছায়া মায়া কায়া সমান)।

(৬) ষষ্ঠত, এ সত্বেও যখন দেখা যায় যে ঘরে আগুন লেগেছে, যুদ্ধে কোনো পক্ষের জয় হয়েছে, যুদ্ধে সৈন্যসজ্জা অথবা জলদস্যু দ্বারা ভান্ডার লুণ্ঠন, আর প্রাকৃতিক বিপর্যয় তখনও একপক্ষে সাধক এই অধ্যাত্মজ্ঞানের প্রবোধ দেন। অন্যদিকে পরিবার বা প্রেমের বন্ধনে বাঁধা মানবিক সুখ লাভের শক্তিও অগ্রাহ্য হয়ে যায়। সাধকদের এতোটা জ্ঞানদর্শন নিরঙ্কুশও ছিল না। জীবনপ্রীতি, সহানুভূতি ছিল বলেই তাঁদের সাধনচর্যা সকলের গান হিসেবে প্রচারিত হয়েছে। এ ধরণের দুটি উদ্ধৃতি দেওয়া হ'ল।

(i) "জোইনি তঁই বিনু খনহি ন জীবমি।
তো মুহ চুম্বী কমলরস পীবমি।।

[যোগিনী তো-বিনা মুহূর্তও বাঁচি না। তোর মুখ চুম্বন করে কমলরস পান করি।"]
এই পদের শেষে একটি অঞ্চল উড়িয়ে আনন্দ প্রকাশের দৃশ্য বর্ণিত হয়েছে। সুকুমার সেন এই পদটির টীকায় বলেছেন ঃ

"উদ্দাম হাওয়ায় পরিধেয় বস্ত্র অথবা অঞ্চল উড়াইয়া মনের আনন্দ প্রকাশ শিশুরা ও মেয়েরা করিত। প্রাকৃতপৈঙ্গলে উদ্ধৃত একটি কবিতায়ও আছে - 'চেলু দুলাবে।"

(ii) "সোন রুঅ মোর কিম্পি ন থাকিউ।
নিঅ পরিবারের মহানেহে থাকিউ।।"

[সোনারূপা কিছুই থাকল না। নিজ পরিবারে আমি একসময় খুব সুখে ছিলাম।] বর্তমানে চৌকোটি ভান্ডার শেষ বলে বাঁচা মরায় বিশেষ তফাৎ নেই বলছেন চর্যাকার। এখানেও বণিকের সম্পদহানিতে তার যে জীবন্মৃত অবস্থা তাই আপাতদৃষ্টে মনে হয়। পারিবারিক সুখ যে সমৃদ্ধির সঙ্গে সম্পর্কিত অন্তত সেই মানসিকতাই স্বাভাবিক এই ভাবনাই ভুসুকুর এই চর্যায় দেকা গেল।]

(৭) সপ্তমত, লোকায়ত দর্শনের ট্রাইবাল জীবন থেকেও চিত্রকল্প গ্রহণ করেছেন চর্যাকাররা। হাতি ধরার বা হরিণ শিকারের চর্যা এর উদাহরণ। হরিণ শিকারের চর্যায় একটি হরিণগোষ্ঠীর সম্পর্ক দেখানো হয়েছে। হরিণকে টোপ দেবার জন্য হরিণীকে রাখা হয়েছে। কিন্তু হরিণী হরিণকে এই বিপজ্জনক বন ছেড়ে পালাবার পথ দেখিয়ে দেয়। এখানে অনেকগুলি লোকায়ত দর্শনগত ইঙ্গিত পাওয়া যায়। টোটেম বিশ্বাসের সংকেত আছে, শিকারের বৃত্তি আছে, এছাড়া হরিণীর মাধ্যমে মাতৃতান্ত্রিক সমাজের আভাসও আছে।

(৮) অষ্টমত, বহুবার সংসারকে ভবনদী বলে কল্পনা করেছেন পদকর্তারা।

"গঙ্গা জউনা মাঝেঁ রে বহই নাঈ ।
তথি বুড়িলী মাতঙ্গী যোই আ লীলে পার করেই।।
বাহ তু ডোম্বী বাহ লো ডোম্বী বাটত ভইল উদারা।
সদগুরু পঅপএঁ জাইব পুণু জিণউরা।।"

[গঙ্গা যমুনার মধ্যে এই নদী। সেখানে চঞ্চল ডোমনী বালক যোগীদের অবহেলায় পার করে।]

এই মাতঙ্গীর শক্তিতে অবাক হ'তে হয়। যোগীরা বামাচারী এবং লোকায়ত দর্শন নারীশক্তির কথা বলে। এঁরই নাম মাদার গডেস। ইনিই শক্তিভূতা সনাতনীতে পরিণত হন ব'লে অনুমান করলে ভুল হবে না। নদীরূপা ইনি এখানে প্রকৃতিস্বরূপা।

(৯) নবমত, প্রসঙ্গক্রমে একটি দৃশ্য অত্যন্ত উল্লেখযোগ্য এই বিচারে, কেননা মাত্র ৪৬টি ও কয়েকটি ছিন্ন পদের সাহায্যে এখানে দার্শনিক দ্বন্দ্ব-সমন্বয়েরর বিষয়টি অনুভূত হয়েছে। সেখানে একটি প্রত্যক্ষ মৃত্যু-সৎকার ও শ্রাদ্ধের বিষয়ে অবগতিবিধায়ক পদ পাওয়া যাচ্ছে।

৫০ নং চর্যায় –

"কাঙ্গুচিনা পাকেলারে শবরাশবরি মাতে লা।
অনুদিন শবরো কিম্পি ন চেবই মহাসুঁহে ভেলা ।।
চারি বাসে গড়িল রেঁ দিআঁ চঞ্চালী।
তংহি তোলি শবরো ডাহ কএলা কান্দ সগুণ শিআলি।।
মারিল ভবমত্তা রে দহ-দিহে দিধলী বলী।
হেরি সে সবরো নিরেবন ভঈলা ফিটিলি ষবরালি ।।

[কংনিদানা পাকলো রে শবর শবরী মাতলো। দিনের পর দিন শবর মহাসুখে ভোর থাকার জন্য কিছুই টের পায় না। চার বাঁশে গড়লো রে, চেঁচাড়ি দিয়ে, তাতে তুলে শবরকে দাহ করা হলো, কাঁদলো শকুন-শৃগালী, সংসার-মত্ত মরলো ওরে, দশদিকে শ্রাদ্ধপিন্ড দেওয়া হলো। এই শবর নির্বাণ পেলো, শবরত্ব ঘুচে গেলো।]

বৌদ্ধ দর্শনের সঙ্গে এই চিত্রায়নের সঙ্গতি আছে।

------- গৌতম বুদ্ধের ধর্ম ও দর্শন গ্রন্থে ডঃ সুকোমল চৌধুরী বলছেনঃ

"যিনি ধর্মানুকুশীলনকারী অর্থাৎ সাধনমার্গের পথিক মরণানুস্মৃতি তাঁহার নিকট বন্ধু এবং শিক্ষকের মত সহায়ক। এই মরণানুস্মৃতি ভাবনা রাগদ্বেষেরও পরিপন্থী অর্থাৎ মৃত্যু ধ্রুব জানিলে লোভ, দ্বেষ, মোহ কমিয়া আসা স্বাভাবিক। 'কো জানে মরণং সুবে' অর্থাৎ আগামী কল্যই আমার মৃত্যু হইবে না এই কথা কে বলিতে পারে? ঈদৃশ মৃত্যু চিন্তা মানুষকে পাপকর্ম হইতে সংযত করে।"

অনিত্য দর্শনই প্রধানত এই পদটিকে ঘিরে আছে। তাই এই পদটির প্রথমেই আছে শবরের 'হেঞ্চে কুরাড়ী' বা হৃদয়ে কুঠার। সুকুমার সেন একটি অসাধারণ তথ্য দিয়েছেন তা হলো ঃ 'বধদন্ডপ্রাপ্ত ব্যক্তির গলায় বধ অস্ত্র কুঠার বাঁধিয়া দেওয়া হইত।' আশ্চর্য এই শবরকে হত্যাই করা হ'ল বলেও ইঙ্গিত মিলছে। কোনো অসামাজিক কাজ করেছিল কি শবর? তার শূন্য মেয়েকে নিয়ে বিলাস করার কথাও এই পদে ব্যক্ত। কঙ্গুচিনা পাকার সঙ্গে কৃষিজীবী শবরের জীবনের সুখকে একত্র করা হয়েছে। মৃত্যুও শেষ নয়, তার দেহের দাহ হলো – শকুন ও শিয়ালী তার চিহ্ন পেল না। তাই কাঁদল। এভাবেই শবরের চিহ্ন পৃথিবী থেকে মুছে গেলো। তবে দশদিকে শ্রাদ্ধপিণ্ড দেওয়া হয়েছে, একথা খুব জাঁকিয়ে সাধক যোগী প্রচার করেছেন। পারলৌকিক কাজ করার সঙ্গে উচ্চবর্ণের সংস্কারের সাদৃশ্য আছে। সমন্বয়গত আচার নজরে আসে।

(১০) শেষত, ২১ নং মুষিক চর্যা নামধেয় চর্যায় জীবনবিন্যাসে অন্য মেরুকে দেখা গিয়েছে। পদটি হ'লো –

"নিসি অন্ধারী মুসার চারা।
অমিঅ ভখঅ মুসা করঅ আহারা।।
মারবে জোই আ মুসা পবণা।
জেঁন তুটঅ অবণা-গবণা।।"

[অন্ধকার রাত্রিতে মুষিকের আহার-অন্বেষণ। মুষিক অমৃত অর্থাৎ দুর্লভ খাদ্য খায় এবং তাহা জড়ো করে। ওরে যোগী পবনরূপ মুষিককে মারো। তাহাতে তাহার আনাগোণা বন্ধ হইবে।]

শস্য নষ্ট করা মুষিককে মারতে পিছপা হ'তে বারণ করা হচ্ছে। অমৃতস্বরূপ শস্য কৃষকের কাছে। পরেই সাধনইঙ্গিত দেওয়া হচ্ছে। একই ফর্মে বাঁধা হয়েছে চর্যার অর্থকেও। দুই অর্থ দুই দর্শন। রাগ ভৈরবীতে গাওয়া হয়েছে মহীধরপাদের গানটি। এর প্রথম ছত্র হ'ল –

"তিনি এঁ পাটে লাগেলি রে অনহ কসন ঘন গাজই।
তা সুনি মার ভয়ঙ্কর সে সঅ মন্ডল সএল ভাজই।।
মাতেল চীঅ গঅন্দা ধাবই।
নিরন্তর গঅনন্ত তুসেঁ ঘোলই।।"

[তিন পাটে লাগলাম। কালো মেঘ গর্জন করছে। ভয়ঙ্কর মার, সকল মন্ডল বিচলিত হয়। মাতাল মন দস্যু হয়ে ধায়। তার নিরন্তর তৃষ্ণায় যেন আকাশ ঘুলিয়ে ওঠে।] ডুবতে ডুবতে ঘুরতে ঘুরতে প্রমত্ত মনের বিষয়াসক্ত অস্থির অবস্থা প্রাকৃতিক মেঘান্ধকার দৃশ্য দিয়ে উপমিত হয়েছে। অন্ধকার আকাশ দুর্যোগের সংকেত। আর কাপাস ফুল ফুটে শুভ্র আলোময় হয় হৃদয়াকাশ। এই চিন্তার মধ্যে কোনো কূট প্রহেলিকাই নেই।

মর্ত্ত মানবের জীবনপ্রীতি তাকে মৃত্যুর ব্যাপারে অনমনীয় মনোভাবে দৃঢ় করে তোলে। মৃত্যুকে সে ধ্রুব পরিণাম বলে জেনেও অমৃত সন্ধানী। যাঁরা বিশ্বাস করেন না যে আত্মা বলে পাঞ্চভৌতিক দেহোত্তর কিছু আছে, তাঁরা কিন্তু মানবজীবনধারার আবহমান চলিষ্ণুতা দেখতে ভুল করেন নি। দেহের মৃত্যু হ'লেও সমষ্টির মানবের মধ্যে আগামী মানুষের মধ্যে সে তার সংস্কার বাহিত করে দিতে চায়। মানুষের অনন্ত উত্তরাধিকার তাই একমাত্র লোকায়ত বলে সে দেখেছে, জেনেছে। অধ্যাত্মবাদীও সম্ভবত এহেন প্রাকৃত নিয়তিকে লঙ্ঘন করতে পারেন নি। এজন্যই দুই বিরুদ্ধ দর্শনের দ্বন্দ্ব সমন্বয় চর্যাগানেও অনুভূত হয়। পল্লব সেনগুপ্ত লোক সংস্কৃতির সীমানা ও স্বরূপ গ্রন্থে সংক্ষেপে এই বক্তব্যটির সার তুলে ধরেছেন বলে মনে করি ঃ

------- "ভারতীয় দর্শন ধর্ম ও আচারবিধির যে বহুবিচিত্র স্ফূরণ কয়েক হাজার বছর ধরে ঘটে চলেছে, তার বৃহদংশ আবর্তিত হয়েছে লোকায়ত মতকে কেন্দ্র করেই, হোক না তা প্রচ্ছন্নভাবে। প্রাচীন ভারতীয় জীবনচর্যার মূল দুটি শ্রেণীপরিচয় বেদানুসারী এবং বেদবিরোধী। ক্ষাত্র-অস্ত্র, ব্রাহ্মণ্য-বুদ্ধি এবং বৈশ্যীয়-বিত্ত একত্রে মেলবদ্ধ হয়ে করেছে প্রথমটির পরিপোষণ ও দ্বিতীয়টির উৎসাদন - কিন্তু বৃহত্তর জনজীবনের আশা-আকাঙ্খা-অভীপ্সা মূর্তিমন্ত হয়েছে দ্বিতীয়টিকে অবলম্বন করেই। প্রত্যক্ষ-সংগ্রাম তার অনমনীয় এবং অপরাজেয় সত্তা যে বহু-শতাব্দীর ঝড়-ঝঞ্ঝাকে অতিক্রম করেও সুদৃঢ় হয়ে আছে তাতে আর সন্দেহ কী? লোকায়ত ভাবনাদর্শ আজও তাই প্রচ্ছন্ন থেকে প্রাচীন ভারতীয় সংস্কৃতির প্রাণধারাকে সঞ্জীবিত রেখে চলেছে অবিরামভাবে।"

শেষ পর্যন্ত আনন্দবাদী বৈষ্ণবরাও। সে আনন্দও প্রেম থেকে লব্ধ। মৃত্যুকে নিয়ে নেতিবাচকভাবে না ভেবে জীবনে দেহী বা বিদেহী আনন্দকে ঋণঅমরতা বলে মনে করানো এই চর্যাগানগুলি তাই অবিস্মরীয়।

চর্যাপদগত মৃত্যুভাবনা ঃ

লোকায়ত বিস্তার-

তথ্যসূত্রঃ- ১। Knowledge Encyclopedia ed. By Shaila Brown, Daniel Mills, Ben Morgan, Penguin Random House, p.179.
২। চর্যাগীতি পদাবলী - সুকুমার সেন, পৃ. ১৭।
৩। ঐ ; পৃ. ৩০।
৪। লোকায়ত দর্শন : দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়; পৃ. ১১৮-১৯।
৫। ঐ ; পৃ. ১৬।
৬। ঐ ; পৃ. ৫৪২।
৭। চর্যাগীতি পরিক্রমা: ডঃ নির্মলদাশ; পৃ. ১৯।
৮। ঐ ; পৃ. ১৯।
৯। মধ্যযুগে বাংলার সমাজ ও সংস্কৃতি - সম্পা. অনিরুদ্ধ রায় ও রত্নাবলী চট্টোপাধ্যায়; বাঙ্গালীর ধর্মীয় স্থাপত্য চর্যা (পঞ্চদশ-সপ্তদশ শতক)- হিতেশরঞ্জন সান্যাল; পৃ. ২৬৮।
১০। ঐ ; বঙ্গীয় সমাজে জাতিবর্ণ প্রথা - স্বপ্না ভট্টাচার্য পৃ. ১২৩।
১১। ঐ ; পৃ. ১২৭-১২৮।
১২। বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত (প্রথম খন্ড) - অসিত কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় পৃ. ১৫৮।
১৩। ঐ ; পৃ. ১৭০।
১৪। চর্যাগীতি প্ররিক্রম ; পৃ ৯৮।
১৫। লোকসংস্কৃতির সীমানা ও স্বরূপ - পল্লব সেনগুপ্ত; পৃ. ৩৪৪।
১৬। বাংলার লোকসংস্কৃতির সমাজতত্ত্ব — বিনয় ঘোষ; পৃ ৪১। [বাংলার ব্রত এবং অবনীন্দ্রনাথ]
১৭। চর্যাগীতি পদাবলী; পৃ. ১২৮।
১৮। গৌতম বুদ্ধের ধর্ম ও দর্শন - সম্পা. ডঃ সুকোমল চৌধুরী, পৃ. ৬১।
১৯। চর্যাগীতি পদাবলী; পৃ. ১৫০।
২০। লোকসংস্কৃতির সীমানা ও স্বরূপ ; পৃ. ৩৪৮।

গ্রন্থপঞ্জীঃ-

১। গৌতম বুদ্ধের ধর্ম ও দর্শন - ডঃ সুকোমল চৌধুরী।
২। চর্যাগীতি পদাবলী - সুকুমার সেন।
৩। চর্যাগীতি পরিক্রমা - ড: নির্মল দাশ
৪। চর্যাপদ - অতীন্দ্র মজুমদার (সম্পা)।
৫। নলেজ এনসাইক্লোপিডিয়া।
৬। বাংলার লোকসংস্কৃতির সমাজতত্ত্ব - বিনয় ঘোষ।
৭। বাংলা সাহিত্যে অতীন্দ্রিয়বাদের ভূমিকা - যোগীলাল হালদার।
৮। বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত (১ম খন্ড) - অসিত কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়।
৯। মধ্যযুগে বাংলার সমাজ ও সংস্কৃতি - অনিরুদ্ধ রায় ও রত্নাবলী চট্টোপাধ্যায়। (সম্পা.)।
১০। লোকসংস্কৃতির সীমানা ও স্বরূপ - পল্লব সেনগুপ্ত।
১১। লোকায়ত দর্শন - দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়।
১২। শিলালেখ তাম্রশাসনাদির প্রসঙ্গ - ডঃ দীনেশচন্দ্র সরকার।